**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী**

**ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে বিশেষ ফিচার**

**বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও তাঁর জন্মশতবর্ষের ক্ষণগণনা**

মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান

 পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। পাকিস্তানি বাহিনী বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসর্মপন করলেও সেদিন বাঙালিরা তৃপ্ত ছিল না। চারিদিকে যেন একটা শূণ্যতা বিরাজমান ছিল। সেই শূণ্যতা হলো বিজয় এসেছে কিন্তু বিজয়ের নায়ক নেই। যিনি ১৯৪৮ এর পর থেকে একটু একটু করে বাঙালিকে একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ‘যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকবিলা করার ডাক দেন তিনি। বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে জনতার মাঝে তিনি নেই। যার নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়, পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থেকেও যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অনুপ্রেরণা ও শক্তির উৎস তিনিই বিজয়ের দিনে অনুপস্থিত। তাই বিজয়োৎসব খুব বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি।

 মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ইয়াহিয়া খান যখন বঙ্গবন্ধুকে তথাকথিত দেশদ্রোহিতার জন্য বিচার শুরু করেন, তখন বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাঁর মুক্তির জন্য সারা পৃথিবী থেকেই দাবি ওঠে। ইতোমধ্যে পাকিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বিশ্বনেতৃবৃন্দের চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি পাবার পূর্বমূহুর্ত থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কাল বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ।

 মুক্তি দেবার অব্যবহিত পূর্বে জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কিছু অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এক্ষেত্রেও তীক্ষ্ম কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। ভুট্টো এধরনের একটি প্রস্তাব দেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসাথে থাকতে পারে কি না। তখন বঙ্গবন্ধু উত্তর দেন যে, আমি আগে আমার মানুষের কাছে ফিরে যাই, তারপরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেব (সূত্র: Stanley Wolpert, Zulfi Bhutto of Pakistan, His Life and Times, Oxford University Press, 1993, P. 173-174)।

 তিনি লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ঢাকায় তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। লন্ডনে কয়েক ঘণ্টার যাত্রাবিরতিকালে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হীথ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসেন। অতঃপর রয়্যাল এয়ারফোর্সের বিমানে করে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে আসেন এবং ভারত রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁর এই যাত্রা বিরতিকালে এক ফাঁকে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে জিজ্ঞেস করেন যে, বাংলাদেশে অবস্থানরত মিত্রবাহিনী কখন ভারতে ফিরে আসবে। ইন্দিরা গান্ধী তখন উত্তর দেন যে, আপনি (বঙ্গবন্ধু) যেদিন চাইবেন, সেদিনই। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি তাঁর উড়োজাহাজ রাজহংসে চড়ে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশে আসার জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু বিনয়ের সাথে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

 তিনি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি তা প্রতিমূহুর্তে তাঁর আচরণে প্রকাশ পায়। তিনি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় দাঁড়িয়ে ভুট্টোর উদ্দেশ্যে বলেন যে, ‘তুমি ভাল থাক। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে’। পাকিস্তান থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে ঢাকা। পথের দুরত্বও যতখানি, ঠিক ঘটনাগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রকৃত বিজয় দিবস। কারণ বঙ্গবন্ধু এই সময়ে বা দ্রুত ফিরে না আসলে অনেকগুলো বিষয় অমিমাংসিত থেকে যেত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ধৈর্যে্যর কারণে বাংলাদেশের অনুকূলে বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি ঘটেছে। অন্য কারও পক্ষে ঐ বিষয়গুলোর দ্রুত সমাধান সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। এ জন্য ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

-২-

 যথার্থভাবে ১০ জানুয়ারিকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার দিন ধার্য করা হয়েছে। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে তাঁর জন্ম যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ১০ জানুয়ারিও তেমনি তাৎপর্যময়। জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু হওয়ায় ১০ জানুয়ারি ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনেকাংশে প্রতিভাত হবে। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এখনও বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর উন্নয়নভাবনা বিষয়ে আলোচিত হবে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে ও বিষয়ে এই উদ্যোগগুলো গ্রহণ করবে এবং অসংখ্য বইপত্র প্রকাশিত হবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে পরবর্তী ১৫-২০ বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নের কোনো স্তরে অবস্থান করতো, তার একটি সমীকরণও হবে এইসব আলোচনা ও লেখালেখিতে।

#

০৬.০১.২০২০ পিআইডি ফিচার

লেখক : উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।